ছাত্র বিক্ষোভ দমন

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার ও সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলনের কণ্ঠরোধ

সার সংক্ষেপ:

২০১৮ সালে বাংলাদেশে দুটি বড় ছাত্র আন্দোলন হয়। সে বছর এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিনিয়র শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরির কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের ডাক দেয়। এর কিছুদিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় কয়েকজন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর জেরে জুলাই ও আগস্টে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে পথে নামে।

শিক্ষার্থীদের দুটি আন্দোলনই ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সেগুলো সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। দুটি ঘটনাতেই সরকার প্রথমে আন্দোলনকারীদের দাবিগুলো মেনে নেয়। এরপর- কোটা সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিজের দেয়া ঘোষণা থেকে পিছু হটে সরকার দাবি বাস্তবায়নে গড়িমসি করতে থাকে; আর নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেয় বলপ্রয়োগ ও প্রতিহিংসার কৌশল।

দুটি আন্দোলনে সরকারের প্রতিক্রিয়ায় লক্ষণীয় ছিল- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ। সরকারি দল ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত অজ্ঞাতপরিচয় সশস্ত্র ব্যক্তিরা লাঠিশোটা, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের আক্রমণ করে। আন্দোলনে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা করে পুলিশ; কারো নামোল্লেখ না করে দায়ের করা এসব মামলায় খেয়াল খুশিমতো ছাত্রছাত্রীদের গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সরকারি ভাষ্য প্রচারের সুবিধার্থে ও সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে সরেজমিন সংবাদ পরিবেশনে বাধা সৃষ্টি এবং বাংলাদেশী সাংবাদিকদের নির্যাতন ও আটক করা হয়। বিক্ষোভ থেমে যাবার বহুদিন পরও অনেক আন্দোলনকারীদের শিক্ষার্থীদের ও তাদের পরিবারের সদস্য-বন্ধুদের সরকারি নজরদারি-ভয়ভীতি-হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, গ্রেফতার-আটকাবস্থার বাইরেও কিভাবে নিপীড়ন অব্যাহত থাকে এবং ভবিষ্যত ভিন্নমতকে কার্যত কণ্ঠরুদ্ধ করা হয়।

এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের এসব আন্দোলনে দমনপীড়ন ও বৃহত্তর পরিসরে নাগরিক সমাজের উপস্থিতির ইতি টানতে সরকারের যে চেষ্টা তার মধ্যে যোগসুত্র খোঁজা হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার কর্মী, সংগঠক ও সাংবাদিকদের তুলনামূলক তরুণ একটি প্রজন্মের উপর কঠোর পীড়ন ও প্রতিক্রিয়া চাপিয়ে দিয়ে সরকার কার্যত বর্তমান সময়ের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে জনঘনিষ্ট আন্দোলন সংগঠনের সম্ভাবনাও রোধ করতে চেয়েছে। কোটা সংস্কার ও সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলনের দাবিগুলো সরকার এক অর্থে মেনে নিয়েছে যদিও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ আন্দোলনকারীদের সুনির্দিষ্ট চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং কিছুটা সমস্যাজনকও- যা প্রতিবেদনে বিস্তারিত বলা হয়েছে। কিন্তু মৌখিকভাবে দাবি মানার ঘোষণা দিলেও যেটা কারো নজর এড়ায়নি তা হলো, দুটি আন্দোলনের সময়ই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংলাপে বসার ন্যুনতম চেষ্টাও সরকারের তরফ থেকে ছিলো না। এ থেকেই বার্তাটি স্পষ্ট-- সিদ্ধান্তের মালিক সরকার, নাগরিকরা কেবল সে সিদ্ধান্ত মানতে পারবে। এর বাইরে কেউ আওয়াজ তুললে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

দৃশ্যতঃ গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত ব্যবস্থা হলেও বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষকরা গত এক দশকে নজিরবিহীন আক্রমণের শিকার হয়েছে। ধর্মীয় উগ্রবাদী, রাজনৈতিক দলের কর্মী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া মানবাধিকারকর্মীদের কেউ কেউ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে । কেননা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো তাদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দিতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক হতে দেখা গেছে। এর বাইরে যারা দশকের পর দশক ধরে মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করছেন এবং যাদের এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও কষ্টার্জিত অর্জন রয়েছে, তারা হয়ে পড়েছেন অপপ্রচারের লক্ষ্যবস্তু। মিথ্যা অভিযোগ ও ভুয়া খবর ছড়িয়ে তাদের চরিত্রহননে লিপ্ত হয়েছে প্রভাবশালী বেশকিছু গণমাধ্যম।

কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে ছাত্রদের বিক্ষোভকে বিশ্বজুড়ে (হংকং, ভারত, চিলি, ইরাক, জলবায়ু সংক্রান্ত আন্দোলন ইত্যাদি) তরুণদের নেতৃত্বে আন্দোলনের যে ধারা চালু হয়েছে তার অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশের নাগরিক সমাজে নতুন আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল এ দুটি আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলনের জবাবে যে দমন-পীড়ন চলে তা কেবল বিক্ষোভকারীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিতে নয়, ভবিষ্যতে নাগরিক আন্দোলন বা সংগঠন বন্ধ করতেও অনমনীয় মনে হয়েছে। শারীরিক নির্যাতন, গ্রেফতার-আটক, মামলা এবং সামাজিক মাধ্যমে হয়রানি-ভীতি প্রদর্শন ও কুৎসা ছড়ানোর যে অশুভ ও আতঙ্কজনক যোগ-- পুরো বিষয়টি বাংলাদেশে মানবাধিকারকর্মী ও নাগরিক সমাজের দুর্যোগকে নতুন তলানিতে নিয়ে ঠেকিয়েছে। সে সময় আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে সরকার এমন খড়গহস্ত হয়েছিল ভাবলে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হবার কারণ রয়েছে। কেননা এ থেকেই প্রতীয়মান হয় ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে সরকারি দল কতো নিচে নামতে প্রস্তুত।